খন্দকার জাহিদ হাসান

গলছে বরফ, কাঁদছে নিটোল

[তিন বছরের শিশুকন্যা নিটোলকে রেখে তার মা-বাবা পরপারে পাড়ি জমালেন। তারপর থেকে নিটোল তার নিঃসন্তান চাচা ফজলু মিঞার কাছে মানুষ হচ্ছিলো। চাচীও অনেকদিন আগেই গত হোয়েছেন। নিটোল নামের নিটোল চেহারার এই মেয়েটি কলেজে পড়তো। তার অনেক জ্ঞান। অবস্থাপন্ন কৃষিজীবী ফজলু মিঞা সামান্য লিখতে পড়তে পারতেন। তাই তাঁর কলেজ-পড়ুয়া ভাইজীটিকে তিনি এক ধরণের সমীহ ক'রেই চলতেন।

ফাল্গুনের এক সন্ধ্যায় নিটোল একখানা উড়োচিঠি পোড়াচ্ছিলো। এ-ধরণের উড়োচিঠি সে অনেক পেতো। আগে নিটোল একটু-আধটু প'ড়ে দেখতো। দুনিয়ার সব বখাটে ছেলেদের দেওয়া শত ভুল বানানে আর ভুল ভাষায় লিখা রাজ্যের যত কুৎসিত উড়োচিঠি। আজকাল আর চোখ বোলাতে নিটোলের রুচি হয় না। সোজা জ্বলন্ত চুলোতে সেগুলো নিক্ষেপ করে সে। সেদিনও তা-ই করেছিলো। হঠাৎ কে যেন কঁকিয়ে উঠলো।]

কে যেনঃ তুমি বড়ো নিষ্ঠুর নিটোল!

নিটোলঃ কে তুমি?

কে যেনঃ চুলোর মাঝে চেয়ে দ্যাখো, আমি কেমন জ্বলছি!

[নিটোল ভ্রূ কুঁচ্‌কে চুলোর মধ্যে উঁকি দিলো। উড়োচিঠিটা পুড়ছিলো। তাহলে কি ওটাই এতক্ষণ তার সংগে কথা বলছিলো? শিহরিত হলো নিটোল।]

নিটোলঃ এ্যায় চিঠি, তুমিই কি এতক্ষণ....

উড়োচিঠিঃ (নিটোলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) হ্যাঁ, আমিই কথা বলছিলাম। তুমি আমাকে এভাবে পোড়াচ্ছো কেন বলোতো?

নিটোলঃ আমি তোমাদের ঘেন্না করি। তোমরা বড্ডো কুৎসিত!

উড়োচিঠিঃ তুমি ভুল করলে নিটোল। আমি আর দশটা বাজে চিঠির মতো নই। আমি অনেক যত্নে লিখা। আমাকে একবার পড়লে তুমি রোমাঞ্চিত হতে। এভাবে উনুনে আমাকে ছুঁড়ে দিতে না।

নিটোলঃ কে তোমাকে পাঠিয়েছে?

উড়োচিঠিঃ যে আমাকে পাঠিয়েছে, সে একজন বিরাট কবি গো! তোমার জন্য তার এক বুক ভালোবাসা!!

নিটোলঃ কোথায় থাকে সে?

উড়োচিঠিঃ (পুড়ে ছাই হতে হতে) এখন তা শুনে কি আর লাভ বলো!? (দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো শব্দ ক'রে) বড়ো দেরী হোয়ে গেছে। তবে বিদায়ের আগে তোমাকে একটা কথা ব'লে যাই। এই প্রেমিক কবিকে নিয়ে জীবনে তুমি সুখী হবে। একদিন সে নিজেই তোমার কাছে আসবে। আমার বিনীত অনুরোধঃ তখন তাকে ফিরিয়ে দিও না। ফিরিয়ে দিলে জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুলটি তুমি করবে। কথা দাও, তাকে তুমি ফেরাবে না? কথা দাও....? ?

[বলতে বলতে উড়োচিঠিটা পুড়ে ছাই হোয়ে গেল। গভীর এক বিষাদে নিটোলের মনটা ভ'রে গেল। তারপর ধীর পায়ে সে ফজলু চাচার ঘরে ঢুকলো এবং দুঃসংবাদ দেওয়ার ভংগীতে তাঁকে একটা কথা বললো।]

নিটোলঃ চাচা, খবর ভালো না!

ফজলু মিঞাঃ কি হোয়েছে মা?

নিটোলঃ বরফ গলছে।

ফজলু মিঞাঃ (বিস্মিত কণ্ঠে) কিসের বরফ গলছে?

নিটোলঃ (বেশ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হোয়ে থাকার পর) থাক, তোমাকে না হয় আরেকদিন বলবো। (হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে) ও চাচা, ভর সাঁঝে শুধু গেঞ্জি গায়ে এভাবে বসে থেকো না। ঠান্ডা লাগবে যে!

ফজলু মিঞাঃ আমাকে আর জ্ঞান দিস্ না তো! মাঘের শীত-ই আমাকে কাবু করতে পারেনি। আর ফাগুন মাসে লাগবে আমার ঠান্ডা? দেখছিস্ না, চারিদিকে কি সুদর মিঠে মিঠে হাওয়া?

নিটোলঃ তোমার ঐ মিঠে হাওয়ার মধ্যেই কিন্তু বেশী জীবাণু থাকে। ভরা শীতেই বরং বাতাসে ততো রোগ-জীবাণু থাকে না। কারণ বেশী ঠান্ডায় ওদের তেমন বংশবৃদ্ধি হয় না। এখন এই ঋতু বদলের সময়টাই আসলে বেশী বিপদজনক।

[নিটোল একখানা চাদর এনে ত্রস্ত হাতে ফজলু মিঞার গায়ে জড়িয়ে দিলো। চাচা মুগ্ধ হোয়ে নিটোলের কথা শুনতে থাকলেন। ভাইজীকে নিয়ে গর্বিত চাচার অনেক স্বপ্ন।

মাস দুয়েক পরের কথা। বোশেখ মাসের ভর-দুপুরেই সেদিন বেশ ঝোড়ো হাওয়া বইছিলো। হঠাৎ ফজলু মিঞার বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা সজনে গাছটা থেকে একটা সজনে এসে মাটিতে পড়লো। সেদিন নিটোলের কলেজ বন্ধ ছিলো। রান্নাঘরে সে কাজ করছিলো। ফজলু মিঞা নিটোলের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন।]

ফজলু মিঞাঃ ওরে ও নিটোল, দেখে যা কান্ড!

নিটোলঃ শুনতে পাচ্ছি, বলো।

ফজলু মিঞাঃ জীবনে বহু তাল-বেল পড়তে দেখেছি। নারকেল-সুপারীও বাদ যায়নি। এখন দেখছি সজনেও পড়ছে রে!

নিটোলঃ সজনে তো পড়তেই পারে চাচা। সময় হ'লে সব ফল-ই পড়ে। সজনেই বা বাদ যাবে কেন?

[বল্‌তে বল্‌তে খুন্তিহাতে রান্নাঘর থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এলো নিটোল। কোমরে ওড়না পেঁচানো।]

ফজলু মিঞাঃ না-না, তা বল্‌ছি না। তবে কথা হলো, সজনের মতো এ-রকম একটা শুট্‌কি জিনিসও যদি গাছ থেকে পড়ে, তা হ'লে তাজ্জব-ই বন্‌তে হয়!

নিটোলঃ (চাচার সামনে হাঁটু গেঁড়ে ব'সে) এটা তোমার ভুল। শোনো, শুট্‌কি-মুট্‌কি কোনো ব্যাপার নয়। আসল কথা হলো, যখন-ই কোনো ফল বোঁটামুক্ত হয়, তখন-ই তা....

ফজলু মিঞাঃ (নিটোলের কথায় বাধ সেধে) কিন্তু সজনে কোনো ফল নয়, ওটা তো সব্জী। তাও আমাদের কালে তো ওটাকে আমরা কখনো সব্জী ব'লে গণ্যই করতাম না। মানুষ সজনে খাওয়া ধরলো এই সেদিন। আগে

আমরা কখনো ঐ বস্তুটি ছুঁতামও না। এখন বাধ্য হোয়ে খাই। কি আর করা? জিনিসপত্রের যা দাম আজকাল!

নিটোলঃ সজনেকে গণ্য করো, আর না-ই করো, তাতে কিছু যায় আসে না। উদ্ভিদবিদ্যা মতে তাল-বেলের মতো সজনেও একটা ফল। যখন-ই কোনো ফল বোঁটামুক্ত হয়, ...

ফজলু মিঞাঃ (নিটোলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) তখন-ই তা সোজা মাটিতে এসে পড়ে। এ-সব কথা জানি। তোর খালি বিদ্যা জাহির করা!

নিটোলঃ (চোখেমুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে তুলে) আচ্ছা। বলোতো চাচা, জিনিসপত্র আকাশের দিকে না ছুটে মাটিতে এসে পড়ে কেন?

ফজলু মিঞাঃ কেন আবার? সবকিছু আকাশের দিকে ছুটলে দুনিয়াটা লন্ড-ভন্ড হোয়ে যাবে যে! সংসারে অশান্তি দেখা দেবে না?

নিটোলঃ সে তো হলো তোমার শাস্ত্রীয় কথা। কিন্তু বিজ্ঞান কি বলে, তা জানো?

[ফজলু চাচা এবার হার মানলেন। দু'পাশে মাথা নাড়লেন। নিটোল আবার পই পই ক'রে উঠলো। তার চোখে-মুখে এক ধরণের দুষ্টুমীভরা হাসি খেলা করছিলো।]

নিটোলঃ ঠিক আছে। এবারে একটু মাথা খাটিয়ে বলো তো!

ফজলু মিঞাঃ (দ্বিধান্বিত কন্ঠে) কি বলবো?

নিটোলঃ ঐ যে বল্‌লাম, গাছের ফল আকাশে না গিয়ে মাটিতে এসে পড়ে কেন?

[ফজলু মিঞা প্রমাদ গুণলেন। তবু চেষ্টা করতে দোষ কি? কিছুক্ষণের জন্য গভীর চিন্তায় মগ্ন হোয়ে গেলেন তিনি। তারপর দু'চোখ বন্ধ ক'রে দু' হাত নেড়ে নেড়ে চাচা তাঁর নিজস্ব 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' প্রদান করতে আরম্ভ করলেন।]

ফজলু মিঞাঃ ব্যাপার হলো যে, ফলের বোঁটা যখন গাছ থেকে আল্‌গা হোয়ে যায়, তখন সেটা আর বাতাসের উপর ভেসে থাকতে পারে না। কারণ বাতাসের চেয়ে ফল ভারী। তখন জিনিসটা আপ্‌সে আপ্‌ মাটির দিকে নেমে আসতে শুরু করে। (চোখ খুলে) ঠিক বলিনি?

[নাহ্‌, মন্দ বলেননি ফজলু চাচা! তবু নিটোল মুখ টিপে হাসতে থাকলো।]

নিটোলঃ ঠিক-ই বলেছো। তবে এর মধ্যে 'মাধ্যাকর্ষণ' নামের একটা ব্যাপার রয়েছে।

ফজলু মিঞাঃ সেটা আবার কি জিনিস?

[নিটোল ফজলু চাচাকে খুব সহজ ভাষাতে মাধ্যাকর্ষণ বোঝাতে থাকলো। একদিন আষাঢ় মাসের এক বিকেলে নিটোল কাক-ভেজা হোয়ে কলেজ থেকে বাসায় ফিরলো। একমনে সে ভাবছিলো। কোথায় গেল সেই উড়োচিঠির কবি, যার একদিন নিটোলের কাছে আসার কথা ছিলো? বাইরে তখনো ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিলো। ভেজা কাপড় পালটিয়ে নিটোল ফজলু চাচার ঘরে এসে ঢুকলো। চাচা তখন দিবানিদ্রার পর চৌকির উপর ব'সে ক্রমাগত হাই তুলছিলেন।]

নিটোলঃ চা দিবো?

ফজলু মিঞাঃ (হাঁ-সূচক মাথা নাড়ার পর) খুব ভিজেছিস্‌, না?

[নিটোল কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেল। মিনিট চারেকের মধ্যেই সে চা হাতে ফিরলো। ফজলু মিঞা তখনো হাই তুলে চলেছিলেন।]

ফজলু মিঞাঃ (চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে) তোর মন এত খারাপ কেন?

নিটোলঃ (দশ সেকেন্ড চুপ্‌চাপ্‌ থাকার পর) চাচা, তোমাকে একদিন বলেছিলাম না, বরফ গলছে?

ফজলু মিঞাঃ হ্যাঁ, কিন্তু কিসের বরফ?

নিটোলঃ মেরু প্রদেশের বরফ।

ফজলু মিঞাঃ মেরু প্রদেশ আবার কোথায়?

নিটোলঃ পৃথিবীর দু'টো মেরু— উত্তর মেরু, আর দক্ষিণ মেরু। দু'জায়গাতেই সমানে বরফ গলছে? লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে জমে থাকা কোটি কোটি টন বরফ দ্রুত গলছে।

ফজলু মিঞাঃ তাতে অসুবিধাটা কি?

নিটোলঃ এই বরফ-গলা পানি পৃথিবীর সবগুলো সাগরে এসে পড়ছে। এতে ক'রে সাগরের পানির উচ্চতা দিন দিন বাড়তে থাকবে।

ফজলু মিঞাঃ বুঝলাম। তারপর?

নিটোলঃ তারপর আর কি! পৃথিবীর সব নীচু স্থলভাগ আস্তে আস্তে সমুদ্রের নীচে তলিয়ে যাবে।

ফজলু মিঞাঃ নীচু স্থলভাগ কোন্‌ কোন্‌ জায়গা?

নিটোলঃ পৃথিবীর সব ছোটো ছোটো দ্বীপদেশ আর বড়ো বড়ো দেশের উপকূল এলাকা। (সামান্য বিরতির পর) মালদ্বীপ নামের একটা দেশ আছে না?

ফজলু মিঞাঃ হুঁ।

নিটোলঃ ওটা পুরোপুরি ডুবে যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক জায়গাও পানির নীচে তলিয়ে যাবে।

[ফজলু মিঞা চম্‌কে উঠে নিটোলের মুখের দিকে তাকালেন। নিটোল এসব কি বলছে! তাঁর ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিলো না এসব কথা।]

ফজলু মিঞাঃ এসব কথা তোকে কে বলেছে?

নিটোলঃ কলেজের স্যার আর ছাত্র-ছাত্রীরা রোজ-ই এসব নিয়ে আলাপ করছে। এখন তো প্রায় সব মানুষ-ই জানে।

ফজলু মিঞাঃ কই আমি জানতাম না তো!?

নিটোলঃ এ্যাদ্দিন তোমার জানা হোয়ে ওঠেনি। এখন তো জানলে।

ফজলু মিঞাঃ (কিছুক্ষণ চুপ্‌ ক'রে থাকার পর) দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে তো আমরাও পড়ছি, তাই নারে?

নিটোলঃ হুঁ।

ফজলু মিঞাঃ তবে আমার মনে হয়, মানুষ একটা উপায় বের ক'রে ফেলবে। মানুষের যা বুদ্ধি!

নিটোলঃ কচু! মানুষের কোনো আক্কেল-বুদ্ধি নেই চাচা। খালি সর্বনাশ করার তাল!

[নিটোলের শেষের কথাগুলো যেন আর্তনাদের মতো শোনালো।]

ফজলু মিঞাঃ তার মানে?

নিটোলঃ তার মানে, মানুষের উল্টোপাল্টা কাজের ফলেই এই সব ঘটছে।

ফজলু মিঞাঃ তুই একটু বুঝিয়ে বল্‌ না! মানুষের কি উল্টোপাল্টা কাজের ফলে বরফ গলছে?

[নিটোল বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming), জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change), অংগার নির্গমন (Carbon Emission), প্রভৃতি বিষয়ে তার চাচাকে

বোঝাতে থাকলো। সব শোনার পর ফজলু মিঞা অনেকক্ষণ হতবাক হোয়ে বসে রইলেন। তারপর আবার মুখ খুললেন।]

ফজলু মিঞাঃ চিন্তা করিস্ না মা। আল্লাহ্‌তা'লা যখন গজব দিয়েছেন, তখন তিনিই মুস্কিল আসান করবেন।

নিটোলঃ আমার তা মনে হয় না চাচা। যে জটিল প্যাঁচটা মানুষ বাধিয়েছে, তা আল্লাহ্ তা'লা ছোটাতে যাবেন কেন? উনার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই!

ফজলু মিঞাঃ ছিঃ, ওভাবে বলতে নেই মা! আমি বলতে চাইছি যে, হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। সমাধান একটা বেরিয়ে আসবেই আসবে।

নিটোলঃ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) শুধুমাত্র সাগর ফেঁপে ওঠাই নয়, বিপদ আরও অনেক আছে। সারা দুনিয়া জুড়ে দুঃখ-দারিদ্র, রোগ-শোক, অনাহার আর দূর্ভিক্ষ আরও বাড়বে। আফসোসের কথা কি, তা জানো চাচা? আফসোসের কথা হলো, পৃথিবীকে এমন রসাতলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যারা একদম-ই দায়ী নয়, সেই সব গরীব আর নিরীহ মানুষের ভোগান্তিই হবে সবচেয়ে বেশী। এই নিরীহ মানুষগুলো উঠতে-বসতে গাড়ীর তেল পোড়ায়নি, কালে-ভদ্রে বাসে কিংবা ট্রেনে চড়েছে। শিল্প-কারখানা চোখেও দেখেনি, চোখে দেখে থাকলেও মুনাফার কানাকড়ি অংশও তাদের ভাগ্যে জোটেনি। আর এখন তারাই পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য মানুষদের চোখের সামনে মর্মান্তিকভাবে নিঃশেষ হতে থাকবে! ভাবতে পারছো? (সামান্য দম নিয়ে) পৃথিবীতে চিরকাল-ই যতো দুষ্টু উদোর পিন্ডি নিরীহ সব বুদোর ঘাড়ে গিয়ে চেপেছে। এবার-ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

[অনাথা নিটোল কাঁদতে থাকলো। ফজলু চাচারও দু'চোখ বেয়ে দরদর ক'রে অশ্রুধারা নেমে এলো। প্রকৃতি যেন মূহ্যমান হোয়ে গেল। সবাই ফিস্‌ফিস্ শব্দে আলাপ করতে থাকলো। চারিদিকের আকাশ-বাতাস, গাছপালা, পশুপাখী বিলাপ করতে থাকলো।]

বাতাসঃ আমাদের নিটোল ঠিক-ই বলেছে। দু'পেয়ে দুষ্টুরা আমাকে নষ্ট করেছে। এখনও করছে।

আকাশঃ নিটোল অবশ্যই ঠিক বলেছে। সৃষ্টির সেরা কুলাংগারেরা আমাকে ভ্রষ্ট করেছে। এখনও করছে।

বাতাসঃ নিটোল বড়ো সুন্দর, বড়ো মনোহর! কিন্তু ও বড্ডো অসহায়! এক কান্নাকাটি করা ছাড়া ওর আর কিচ্ছু করার নেই।

আকাশঃ আর যাদের কিছু করার আছে, ঐ চেয়ে দ্যাখো, তারা কাঁদছে না। তারা বুঝতেও চাইছে না যে, বড়ো বেশী দেরী হোয়ে গেছে।

গাছপালাঃ আমরা আর কতোদিন নীরবে অবদান রেখে যাবো? আমরা মানুষের হাতে আর কতোদিন ধ্বংস হতে থাকবো?

পশুপাখীঃ জানি না। ওরা আমাদেরও সাবাড় ক'রে চলেছে।

প্রকৃতিঃ ওরা আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। এখনও বাজাচ্ছে।

পশুপাখীঃ বারোটার পর তো তেরোটা হয়। তা হলে কি আমরা ধ'রে নেবো যে, মানুষেরা এখন তোমার তেরোটা বাজাচ্ছে?

প্রকৃতিঃ (মুখ ঝাম্‌টা মেরে) আঃ, থামোতো তোমরা! এখন ঠাট্টা-মশকরার সময় নয়। ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করার চেষ্টা করো।

পশুপাখীঃ আমরা ঠাট্টা করছি না! আমরা আসলেই বুঝতে পারছি না, এখন আমাদের ঠিক কি করা উচিত।

প্রকৃতিঃ ও, তাইতো। আমি দুঃখিত! আমার মনেই ছিলো না যে, তোমাদের ঘটে বুদ্ধি কম।

পশুপাখীঃ ঘটে কম বুদ্ধি থাকা বরং ভালো। দেখছো না, বেশী বুদ্ধিমান দু'পেয়েরা কি কান্ড বাধিয়েছে!?

প্রকৃতিঃ তাই তো। আমার-ই ভুল! তোমরাই আসলে ঠিক বলেছো। কোটি কোটি বছর ধ'রে যখন শুধুমাত্র তোমরা ছিলে, আমি ঠিকঠাক ছিলাম। আর সৃষ্টির সেরা জনেরা আসার পর-ই যতোসব বিপত্তি দেখা দিলো!

[প্রকৃতি পরম স্নেহে পশুপাখীর পিঠ চাপ্‌ড়াতে থাকলো। আর ওদিকে দু'পেয়ে মানুষেরা তর্কে মেতে উঠলো।]

গোঁফওয়ালাঃ এক্ষেত্রে মানুষ মোটেও দায়ী নয়। যুগে যুগে আপনমনেই পৃথিবী উত্তপ্ত হোয়েছে, আবার শীতলও হোয়েছে। এটা একটা প্রাকৃতিক চক্র। এখানে মানুষের কিছু করারও নেই!

দাড়িওয়ালাঃ একদম কিছুই করার নেই— এ কথা ঠিক নয়।

গোঁফওয়ালাঃ কি করার আছে, তুমিই বলো তাহলে।

দাড়িওয়ালাঃ পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়া।

আহ্লাদী তরুণীঃখাপ খাইয়ে নেয়া? তার মানে মোটরগাড়ী চড়া বাদ দিয়ে পুরোনো দিনের সেই ঘোড়াগাড়ীতে সওয়ার হওয়া? (নাক সিঁট্‌কিয়ে) উঁহু-উ-উ! কোনোভাবেই তা সম্ভব নয়!!

দাড়িওয়ালাঃ না, খাপ খাইয়ে নেয়া মানে শুধু ঘোড়ার গাড়ী চড়া নয়। খাবার-দাবার আর পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও আমাদের অভ্যাস পাল্টাতে হবে।

উন্নাসিক যুবকঃ যেমন?

দাড়িওয়ালাঃ যেমন, এখন থেকে আমাদের খাবার-দাবার হতে হবে আরও প্রাকৃতিক। প্রসেস্‌ড্‌ খাবারের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। হাতেবোনা কাপড় পরতে হবে। মোট কথা, কল-কারখানার ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। অর্থাৎ, এখন থেকে জ্বালানী পোড়ানো বন্ধ!

উন্নাসিক যুবকঃ তার মানে, সেই পুরাতন দিনে ফিরে যাওয়া?.... পাগলামি আর কাকে বলে!

দাড়িওয়ালাঃ (হাত উল্টিয়ে) উপায় নেই গোলাম হোসেন!

[ওদিকে কয়েকজন বৈষয়িক মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলো।]

বাড়ীওয়ালাঃ (গাড়ীওয়ালার উদ্দেশ্যে) আমার দোতলা বাসা কেমন দেখলেন?

গাড়ীওয়ালাঃ চমৎকার! কিন্তু আপনাদের স্বামী-স্ত্রী দু'জনের-ই তো বয়স হলো! এখন এত উপর-নীচ করলে জানটা বেরিয়ে যাবে যে!

বাড়ীওয়ালাঃ সেটা আমি ভুলিনি। আমার মাথায় তো আর গোবর পোরা নেই! আমরা মিঞা-বিবি দু'জনে মিলে দোতলায় থাকবো।

গাড়ীওয়ালাঃ আর নীচতলা?

বাড়ীওয়ালাঃ নীচতলা তো পানির নীচে থাকবে!

গাড়ীওয়ালাঃ কিসের পানির নীচে?

বাড়ীওয়ালাঃ কিসের আবার? বরফ-গলা পানির নীচে! দুনিয়ার কোনো খোঁজ-খবর রাখেন না নাকি?

গাড়ীওয়ালাঃ ও তাই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম! সে যা হোক, আমার গাড়ী কেমন দেখলেন?

বাড়ীওয়ালাঃ সুন্দর! কিন্তু প্রাইভেট কার চলাচল বন্ধের আইন শিগ্রী পাশ হতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনার গাড়ী চালাবেন কোথায়? বাসার পেছনের বাগানে?

[আরো অনেকেই অনেক কথা বলছিলো। কেউ কেউ উঁচু গলায় বক্তৃতা দিচ্ছিলো। কেউ কেউ প্রেমের কবিতা লিখছিলো। দেশ-দুনিয়া বরফ-গলা জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে ব'লে প্রেম-পীরিতি তো আর থেমে থাকতে পারে না! কেউ কেউ 'সা-রে-গা-মা' করছিলো। কেউ কেউ আবার বাঁশীও বাজাচ্ছিলো। রোম নগরী পোড়ার সময় যদি নীরো বাঁশী বাজাতে পারে, তবে তাদের-ই বা দোষটা কোথায়? আর ওদিকে লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে জমে থাকা পৃথিবীর কোটি কোটি টন বরফ সমানে গ'লে চলেছিলো। নিটোল তখনো কাঁদছিলো।]

(নির্মম বাস্তবতার তুলিতে আঁকা জীবনের কল্পিত ছবি)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ০৬/০৯/২০০৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন